SEC-2: The making of Indian Foreign policy

4th Semester (H) SEC

Kamal Sarkar

Unit-3. India and South Asia: Relationship with the Neighbours

Ques – ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর?

Q – ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্ক আলোচনা কর?

⇒ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কৌশলগত আগ্রহ :-

ভারতের বৈদেশিক নীতি এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে কেবলমাত্র প্রতিবেশির ~~সঙ্গে~~ সাথে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, তবেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীল বৃদ্ধি পাবে। আর এটি হওয়ার জন্য ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ামুখী বিদেশনীতি তৈরি করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়া ভারত বুকে থাকা রাষ্ট্রগুলির সমন্বয়ে গঠিত, এবং ভারত তাদের মধ্যে একজন গ্রহণযোগ্য নেতা এবং নির্ভরযোগ্য সুশাসন পালনকারী হওয়ার পথে রয়েছে। ~~এবং~~ ভারতকে তার কর্তব্য সম্পর্কে আরও সচেতন ও সংবেদনশীল হতে হবে যা দক্ষিণ এশিয়ার প্রয়োজন। এই অঞ্চলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রহ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভিত্তিক লাইনের (সেনাদের জন্য) শ্রীলঙ্কা, এবং পাকিস্তান ও ভুটান ও নেপাল মধ্যে বিচ্ছিন্ন দল সংগঠনের দরকার; তাছাড়া এই সমস্ত দেশ গুলির আঞ্চলিক সুরক্ষার গ্যারান্টি হিসাবে ভারতের উপর নির্ভর করা উচিত।

চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব শক্তির বিরুদ্ধে এরই ফলে ভারতের পক্ষে দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত প্রতিষ্ঠানের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারত তাদের সাথে কেবল সুসম্পর্ক নয়, তাদের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাও সুরক্ষিত করতে পারে।

Scanned with CamScanner

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ভারতের পাক এবং অঞ্চলের সমস্ত শক্তির সাথে কৌশলগত সহযোগীতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়া :-

দক্ষিণ এশিয়া হিমালয় ও এবং হিন্দুকুশ পর্বত-মালার দক্ষিণে পড়ে থাকা দেশগুলির সমষ্টি সাথে। ভারত পাকিস্থান, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, এবং শ্রীলঙ্কা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশ। এর মধ্যে বেশিরভাগ দেশ পূর্বে ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিল। তাদের একই জাতীয় সংস্কৃতি, সামাজিক ও অভ্যাস এবং অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত দেশই জনবহুলতা, দারিদ্র, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, ইত্যাদি দ্বারা মুখ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়, বিশ্বাস করা হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ায় এই দেশগুলি কেবলমাত্র একে অপরের সাথে সহ-যোগীতা এবং উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত পরিকল্পনা গ্রহনের মাধ্যমে দ্রুত অগ্রগতি করতে পারে। এই বিশ্বাসই পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা (সার্ক) গঠনের দিকে পরিচালিত করে।

(N.B.- সার্ক ও এশিয়ান সম্পর্ক পড়ে study meterial (পেজ ২১০)

প্রতিবেশীদের সাথে ভারতের সম্পর্ক :-

ভারতের একটি দীর্ঘ স্থল সীমা সীমানা ও উপকূল রেখা রয়েছে। এটি পাকিস্থান, নেপাল, ভুটান, চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার, (বার্মা) ~~এবং~~ শ্রীলঙ্কা এবং আফগানি-স্থান এর সাথে সীমানা ভাগ করে দেয়।

(Look East) নীতির ভিত্তিতে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। যা কিছু করা হয়েছে তা দেশের জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবেই করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য হল বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তির মর্যাদা অর্জন করা।

৭.৫ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক

Relations between India and Bangladesh

স্বাধীন বাংলাদেশ-এর জন্ম হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। তার আগে দেশটি পাকিস্তানের একটি অঙ্গ ছিল। দেশটি জন্মের পিছনে রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন হওয়ার আগে দেশটি পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিল। গত শতকের ষাটের দশকের মাঝামাঝি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলা ভাষাকেই সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি জানানোর দাবিতে মরণপণ আন্দোলন শুরু করে, যা শেষ পর্যন্ত ৭০-এর দশকে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষ তখন শুধু ভাষা নয়, সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৭০ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে সশস্ত্র পাকিস্তান সৈন্য সংগ্রামী মানুষদের ওপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায় এবং আওয়ামি লিগ প্রধান মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করে। এতে আগুনে ঘি ঢালার অবস্থা হয়। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে ওই বছরের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় 'মুক্তি বাহিনী'। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি মুক্তিবাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ভারতের সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করলে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছেও পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং ভারতই তাকে সর্বপ্রথম একটি 'মুক্ত দেশ' (Free country) হিসেবে স্বীকৃতি জানায়। এই নবজাত রাষ্ট্রটির নাম দেওয়া হল 'বাংলাদেশ'।

একটি মুক্তিকামী জাতির স্বাধীনতার ইচ্ছাকে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখা যায় না, তবে ভারতের সাহায্য ব্যতিরেকে বাংলাদেশ এত তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা পেত কিনা তা তর্কের বিষয়।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুব বেশিদিন একখাতে প্রবাহিত হয়নি। 'বঙ্গবন্ধু' প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অতীব ঘনিষ্ঠ। ১৯৭২ সালের মার্চে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে 'শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। ওই সময় দু-দেশের মধ্যে আদর্শগত মিলও ছিল যথেষ্ট। উভয় দেশই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জোটনিরপেক্ষতার আদর্শে আস্থাশীল ছিল। উভয় দেশই পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে ভাবত। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু-দেশের মধ্যে এই সু-সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই বাংলাদেশের মধ্যেই একটা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ধারণা হয় যে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য দায়ী ভারতের শোষণ ও দাদাগিরি। ক্রমশ এইরূপ ধারণা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দেশের মানুষকে শেখানো হয় যে, ভারত অচিরেই বাংলাদেশকে তার একটি উপনিবেশে পরিণত করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা মুজিবর রহমানকেও ভারতের অনুগামী বলে ভাবতে আরম্ভ করেন। এই ধরনের মনোভাব গড়ে তোলার পিছনে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদত ছিল যথেষ্ট। ১৯৭৫ সালে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিবর এবং তার পরিবারকে হত্যা করা হয়। এর অব্যবহিত পরেই জিয়াউর রহমান সামরিক শাসক প্রধানের পদে অভিষিক্ত হন। ক্ষমতায় আসার পরেই জিয়াউর রহমান ক্রমশ বেশি মাত্রায় ইসলামি মৌলবাদকে উস্কানি দিতে থাকেন এবং দেশের মানুষকে তীব্র ভারত-বিরোধী করে তুলতে থাকেন।

১৯৯৬ সালে মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ানি লিগ ক্ষমতায় এলে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনরায় ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। ১৯৯৬ সালেই গঙ্গার জলবণ্টনকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক জলবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ওই বছরই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল পাকিস্তান বাদে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত দেশের সঙ্গে শর্তহীন বন্ধুত্ব স্থাপনের নীতি (যা সাধারণভাবে Gujral

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Doctrine নামে পরিচিত) গ্রহণ করেন। ওই সময়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ১৯৯৯ সালে কলকাতা-ঢাকার মধ্যে নিয়মিত বাস পরিসেবা চালু করার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি হয়। পরের বছর ২০০০ সালে দু-দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী রেল চলাচল নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ক্রমে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়তে থাকে। এই সম্পর্ক আরও গভীর করার উদ্দেশ্যে দুটি দেশের মধ্যে 'সাপটা' (South Asian Preferential Trade Agreement—SAPTA) স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলস্বরূপ ভারত বাংলাদেশের বহু দ্রব্যের ওপর থেকে শুল্ক হ্রাস করেছে অথবা তুলে নিয়েছে।

২০০১ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে একটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। মৌলবাদী শক্তি দেশের অভ্যন্তরে পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং ভারত-বিরোধী শক্তি জোরদার হতে থাকে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এলে পুনরায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে শুরু করে। ২০০৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মিশরে হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন। পরের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আসেন। এই ঐতিহাসিক সফরে দু-দেশের মধ্যে তিনটি বিষয়ে মউ (MOU) স্বাক্ষরিত হয়—(১) উভয়দেশ একযোগে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করবে, (২) পরস্পরের মধ্যে বন্দি প্রত্যার্পণ করবে এবং (৩) উভয় দেশের মধ্যে সংঘটিত মাদক চোরাচালান ও অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২০১০ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেমন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা, ভারত থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি, দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নততর করা, ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্ট ব্যবস্থা সরলীকরণ, পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণ, বাংলাদেশের পরিকাঠামো, শক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা, কম সুদে বাংলাদেশকে ঋণ প্রদান ইত্যাদি।

২০১৩ সাল নাগাদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রচণ্ড অস্থিরতা চলেছিল। মৌলবাদী জামাতে ইসলামির জঙ্গি কার্যকলাপ বাংলাদেশের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তোলে। এ ছাড়া ধর্মঘট, হরতাল, হিংসা ও মৃত্যুর ঘটনা সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করে। এরই মধ্যে শেখ হাসিনা নির্বাচন ঘোষণা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। জামাত ঘনিষ্ঠ বিরোধী বি এন পি নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচন বানচাল করার ডাক দেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই অস্থির পরিস্থিতিতে নির্বাচন সমাপ্ত হলে ভারতের উদ্‌বেগ বেড়ে যায়। ভারতের আশঙ্কা ছিল, এই নির্বাচনের পর সরকার গড়া মাত্রই পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ ও সংগঠন হাসিনা সরকারকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে ঢাকার ওপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। নয়াদিল্লি অবশ্য এই প্রতিকূল অবস্থায় হাসিনার পাশেই থেকেছে এবং একইসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ধারাবাহিক দৌত্য চালিয়ে গেছে। নয়াদিল্লির যুক্তি ছিল, কট্টর মৌলবাদী জামাতকে প্রশ্রয় দিলে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধ্বংস হবে এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি আরব দেশগুলি থেকে নিরন্তর অর্থসাহায্য পেয়ে চলেছিল। তাই বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল একটি রাষ্ট্র ইসলামিক উগ্রপন্থার হাতে চলে গেলে পরিস্থিতি যে ভয়াবহ আকার নিতে পারে—সে কথাই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমি দেশগুলিকে নিরন্তর বুঝিয়ে চলেছিল। সুখের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। তারা বরাবর জামাতে ইসলামিকে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সওয়াল করে এসেছে। তারা সঠিকভাবেই বুঝেছিল, বি এন পি-জামাত জোট ক্ষমতায় এলে শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের অ-মুসলিম সম্প্রদায়ের তা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দু'দেশের সুসম্পর্কের পথে অন্তরায় : ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, যা এই দু-দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা তুলে ধরা হল :

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(ক) বাংলাদেশের তিনদিকে প্রায় ৪,০৯৮ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ সীমানা রয়েছে ভারতের সঙ্গে, আর অন্যদিকে বঙ্গোপসাগর। তাই বাংলাদেশকে অনেক সময় ভারত বেষ্টিত দেশ (India Locked Country) বলে চিহ্নিত করা হয়। এই দীর্ঘ সীমান্তের মধ্যে ৪২কিমি নিয়ে বেশি সমস্যা দানা বেঁধেছে। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের বিরোধ ও সংঘর্ষ একটি নিত্যকার ঘটনা।

(খ) দ্বিতীয় সমস্যা হল উভয় দেশের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, অবৈধ পাচার, চোরাচালান, সীমান্ত বরাবর বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বিভিন্ন ভারতবিরোধী জঙ্গি ঘাঁটির অবস্থান ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি দু-দেশের সম্পর্ককে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। এই নিয়ে তিক্ততার অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার ভারতীয় উদ্যোগকে আবার বাংলাদেশ ভারতের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস হিসেবে দেখেছে।

(গ) দু-দেশের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা নদীর জলবণ্টন জনিত পারস্পরিক দাবি এবং বিতর্ক। বাংলাদেশে যত নদী রয়েছে তার মধ্যে ৫৪টি ভারত থেকে নির্গত হয়েছে। এইসব নদীর জলবণ্টনকে কেন্দ্র করে দু-দেশের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালানো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'যৌথ নদী কমিশন' গঠন করা হয় ১৯৭২ সালে। গঙ্গা তথা পদ্মাকে নিয়ে যে সমস্যা ছিল তা মিটে যায় ১৯৯৬ সালে দু-দেশের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে। তবে তিস্তার জলকে কেন্দ্র করে সমস্যা এখনও অমীমাংসিত। সাম্প্রতিককালে ভারত ৩০টি আন্তর্জাতিক নদীর গতিপথ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশের উদ্‌বেগ বেড়ে যায়। বাংলাদেশ তার এই সম্পর্কিত অসন্তোষ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চেও তুলেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার ক্ষেত্রে এই নদী সংক্রান্ত মতবিরোধ অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

(ঘ) উভয় দেশের সম্পর্কের ওপর 'ছিটমহল' সম্পর্কিত সমস্যাটিও বড়ো রকমের প্রভাব ফেলেছে। ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল রয়েছে ৫১টি এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহলের সংখ্যা ১১১টি। এইসব ছিটমহলের অধিবাসীদের কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় নেই ; তারা কোনো দেশের নাগরিকও নয়, আবার উদ্‌বাস্তুও নয়। সম্প্রতি এই সমস্যা অনেকটাই মিটেছে।

(ঙ) দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান একটা বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। দু-দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বহাল থাকলেও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে এখনও, যেমন শুল্ক সমস্যা, ট্রানজিট সমস্যা, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ বাংলাদেশে বাণিজ্য করার ব্যাপারে ক্রমশই উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে।

(চ) ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হল অনুপ্রবেশজনিত ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা। ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও এই সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। কাঁটাতারের বেড়া টপকে মানুষ তো দূরের কথা, লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু নিরন্তর অনুপ্রবেশ করছে ভারতের মধ্যে। ২০০৩ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণী মুম্বাই তথা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের বিতারণের ('Push back') ব্যবস্থা নিলে ঢাকা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। শুধু তাই নয়, নারী, শিশু ও মাদক চোরাচালানেও বাংলাদেশের সীমান্তটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাছে একটি নিরাপদ করিডর (Peace corridor) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ছ) বর্তমান পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদ। আর এই সন্ত্রাসবাদীদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি অতি উত্তম আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে চলেছে। এজন্য অনেকে বাংলাদেশকে 'Cocoon of Terror' বলেও চিহ্নিত করেন। বিষয়টি ভারতের কাছে চূড়ান্ত উদ্‌বেগের বিষয়।

(জ) ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ওপর ধর্মীয় মৌলবাদও একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের বি এন পি-জামাত জোট কখনোই ভারতকে ভালো চোখে দেখেনি। তাদের কাছে বন্ধু দেশ হল পাকিস্তান, চিন ও আমেরিকা। শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগের তরফ থেকে অবশ্য বার বার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বাণীই উচ্চারিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(ঝ) বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাকি অঞ্চলের বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ সহজ করার ব্যাপারে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলে ভারতকে উক্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে হয় বহু পথ ঘুরে শিলিগুড়ি করিডর (যাকে চলতি ভাষায় 'ভারতের চিকেন নেক' বলা হয়) হয়ে। সাম্প্রতিক কালে, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীর আমলে দুটি দেশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য উভয় তরফ থেকে ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে। ২০১৫ সালের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার মধ্যে ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়াও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে, সন্ত্রাসবাদ দমন ও বন্দি প্রত্যার্পণ বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘনিষ্ঠতর করার ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সবশেষে 'ট্রানজিট' (Transit) ইস্যুটির কথা উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের কাছে ভারত প্রস্তাব রেখেছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মায়ানমার থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ভারতে আসুক। প্রস্তাবটি আটকে রয়েছে তিস্তার জলবণ্টন বিষয়টি অমীমাংসিত থাকার কারণে। বাংলাদেশ যদি কখনও ভারতের এই Transit প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করে তাহলে দু-দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা নবজাগরণ ঘটবে। এতে বাংলাদেশেরও প্রভূত উপকার হবে। বাংলাদেশ নেপাল এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে খনিজ তেল ও অন্যান্য বহু জিনিস সরাসরি সংগ্রহ করতে পারবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও ভারতের হলদিয়া ও পারাদ্বীপ বন্দরের মধ্যে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান বাড়বে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দু-দেশের মধ্যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির ও প্রতিকূলতার অবসান ঘটবে এবং উভয় দেশ পরস্পরের কাছাকাছি আসবে।

৭.৬ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক

The Relation between India and Pakistan

ভারত ও পাকিস্তান হল এশিয়া মহাদেশের দুই প্রতিবেশী দেশ। অথচ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় থেকেই পাকিস্তান ভারতের সবচেয়ে 'দূরবর্তী প্রতিবেশী' ('Distant neighbour')-তে পরিণত হয়েছে—ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, সম্পর্কের দিক থেকে। জন্মলগ্ন থেকেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও বিবাদে আচ্ছন্ন থেকেছে। **মাইকেল ব্রেচার** (Michael Brecher) ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ককে অঘোষিত যুদ্ধের অবস্থা ("A state of undeclared war") বলে অভিহিত করেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র দুমাসের মধ্যেই কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধের সূত্রপাত। সেই যুদ্ধ আজও চলছে, কখনও তীব্র কখনও প্রশমিত অবস্থায়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই বৈরীমূলক সম্পর্কের মূলে আছে দু-দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাত। ভারত যেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রথম থেকেই নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেছে। ভারত সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে, পাকিস্তান সেক্ষেত্রে সামরিক শাসনকে প্রাধান্য দিয়েছে। ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে, পাকিস্তান সেখানে পশ্চিমি জোটের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। **ভি পি দত্ত** তাঁর *India's Foreign Policy* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'সমস্যাগুলি খুবই জটিল, দৃষ্টিভঙ্গিও বিপরীত, পারস্পরিক ঈর্ষা, সন্দেহ, অবিশ্বাস অত্যন্ত গভীর এবং লক্ষ্যগুলিও পরস্পর বিরোধী।' তিনি আরও বলেন এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই উভয় দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা, উদ্‌বেগ ও আশঙ্কার সূচনা করেছে।

আগেই বলা হয়েছে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতার সূচনা কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে। ভারত ও পাকিস্তানের জন্মের আগে জম্মু ও কাশ্মীর ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন করদ রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ভারত-পাকিস্তান জন্মের সময় জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনোটিতে যোগদান করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে। কিন্তু কাশ্মীর দখল করার জন্য পাকিস্তান উপজাতিভুক্ত হানাদারদের ছদ্মবেশে পাক সেনাবাহিনীকে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে। পরে পাক হানাদার ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ বাধে। শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। যুদ্ধবিরতির ফলে

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

পাক সেনাবাহিনী যে অংশ দখল করে নিয়েছিল সেই অংশ পাকিস্তানের দখলে চলে যায় এবং এখনো পর্যন্ত সেই অংশ পাকিস্তানের দখলেই রয়েছে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেই যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করলে পুনরায় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এবারও জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। পাকিস্তান চায় কাশ্মীর গণভোটের মাধ্যমে স্থির করুক তারা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায়, না ভারতের সঙ্গে থাকতে চায়। গণভোটের প্রস্তাব ভারতই প্রথম উত্থাপন করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ভারতকে সেই প্রস্তাব থেকে সরে আসতে হয়। যাইহোক পাকিস্তান এই গণভোটের ইস্যুটিকে সম্বল করে কখনও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে, কখনও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতকে বিব্রত করার চেষ্টা করে গেছে।

ভারত-পাক বিরোধের ক্ষেত্রে কাশ্মীর সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন নদীর জলবণ্টনকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ বাধে। ১৯৪৮ সালে এক চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানকে কয়েকটি নদীর জল ব্যবহারের সুযোগ দেয় ভারত। পরিবর্তে পাকিস্তানেরও সংযোগকারী খাল খনন করার কথা ছিল। তা না করায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তিক্ততা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৫৩ সালে ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধকে কেন্দ্র করে এবং ১৯৬০ সালে বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় সিন্ধু, ঝিলম, শতদ্রু, বিয়াস প্রভৃতি নদীকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। বলাবাহুল্য পরবর্তীকালে এসব ক্ষেত্রেও দু-দেশের মধ্যে বিবাদ বাধে।

ভারত-পাক বিরোধের অপর একটি কারণ **সীমান্ত বিরোধ**। ১৯৫৮ সালে গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। পাকিস্তান চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে জোর করে কচ্ছের রান অঞ্চলের বিরাট অংশ দখল করে নিলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধ বাধে। ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এই বিষয়ে বিরোধ-মীমাংসার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কে ভারতের দাবির ৯০ শতাংশ মেনে নেয়।

পাকিস্তানের নিরন্তর সমরসজ্জাও (Armament) ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। নিজেকে সমরাস্ত্রে বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পশ্চিমি জোটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও চেয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের পরিস্থিতি বজায় রাখতে, যাতে তার অস্ত্র বিক্রির ব্যাবসা অব্যাহত থাকে।

ভারতের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেও দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপে ইন্ধন জুগিয়েছে, নাগা ও মিজো বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে, পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এ ছাড়া কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা তো পাকিস্তানের কাছ থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পাচ্ছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ **মুক্তিযুদ্ধকে** কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ও শেষ পর্যন্ত তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে। যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে এবং ভারতের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।১৯৭২ সালের ২ জুলাই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে **সিমলা চুক্তি** স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে দু-দেশের সম্পর্ক কিছুটা উন্নত হয়। সিমলা চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান সমস্ত সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য সম্মত হয়।

১৯৭৪ সালে ভারত ভূগর্ভে পরীক্ষামূলক **আণবিক বিস্ফোরণ** ঘটায়। ভারতের তরফ থেকে আণবিক শক্তিকে কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও পাকিস্তান এই ঘটনাকে যথেষ্ট উদ্‌বেগজনক বলে মন্তব্য করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ভারতের এই 'আণবিক ব্ল্যাকমেল' সহ্য করবে না বলে হুমকি দেন।

১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে তীব্র কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। ভারত সীমান্তে নতুন সৈন্য সমাবেশের ফলে উভয় দেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি বেনজির ভুট্টো পাক সংসদে ঘোষণা করলেন যে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে পাকিস্তান কোনো আপস করবে না। ১৯৯৪ সালের ১—৩ জানুয়ারি তিনদিনব্যাপী দু-দেশের মধ্যে সচিব পর্যায়ে বৈঠক হল। কিন্তু কাশ্মীর ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য থেকেই গেল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৯৯৬ সালের ৪ জুন পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার কাছে 'ইতিবাচক' দৃষ্টিভঙ্গির আর্জি জানালেন। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পরে পাকিস্তান নিজেই বেঁকে বসল। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তান মার্কিন হস্তক্ষেপ দাবি করল। প্রত্যুত্তরে ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধানে মার্কিন হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করল। সমস্যা মিটবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেই—জানিয়ে দিল ভারত। **আই কে গুজরাল** প্রধানমন্ত্রী হবার পর কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে আর এক দফা চেষ্টা চালানো হয়েছিল। গুজরাল আশা করেছিলেন, পাক প্রধামন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সুবাদে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সহজ হবে। কিন্তু সে আশা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

অতঃপর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকল ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে। ৬ এপ্রিল, ১৯৯৮, ১৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ঘৌরির পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সফল হল পাকিস্তানে। ১১ মে রাজস্থানে ভূগর্ভে তিনটি পরীক্ষামূলক **পরমাণু বিস্ফোরণ** ঘটাল ভারত। ১৩ মে ফের দুটি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত ঘোষণা করল পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শেষ। পাকিস্তান এর উত্তরে ২৮ মে ৫টি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটাল। ৩০ মে ফের একটি বিস্ফোরণ ঘটাল পাকিস্তান।

পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর এই মরিয়া প্রতিযোগিতা দেখে উপমহাদেশের মানুষ দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এই টান টান উত্তেজনা কিছুদিনের জন্য প্রশমিত হয়। ১৯৯৮-এর ১০ জুলাই ভারত-পাকিস্তান উভয়েই একটি অহিংস চুক্তিতে সই করতে রাজি হল। ১৯৯৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি **প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর** ঐতিহাসিক লাহোর বাস-যাত্রা ঘটল। তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ স্বয়ং বললেন, সম্পর্কের বরফ গলছে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। ১৯৯৯ সালের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হল **কার্গিল যুদ্ধ**। মাস দুয়েক চলার পর ২৬ জুলাই সংঘর্ষের অবসান ঘটল।

১৯৯৯-এর অক্টোবরে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতাচ্যুত করে পারভেজ মুশারফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য বাজপেয়ী নতুন করে উদ্যোগ নিলেন।

২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মাঝামাঝি—এই সময়ের মধ্যে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দু'দেশের নেতারা পারস্পরিক মত বিনিময় করেছেন, শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন, দু-দেশের ক্রিকেট দলের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ২০০৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে UPA সরকার গঠনের পরও দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

এ যাবৎ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক রেষারেষির কারণে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অতি নিম্ন-পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল। ২০০১-০২ সালের পর থেকে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা থেকে উভয় দেশের কোনো লাভ হয়নি—এই বোধ থেকে তারা এখন থেকে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান বাড়ানোর ব্যাপারে সক্রিয় হয়। ২০০৪-০৫ সালে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৭-০৮ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ককে একটা বিরাট ধাক্কা দিলেও বাণিজ্যিক লেনদেন আগের মতোই চলতে থাকে।

২০০৮-০৯ সাল নাগাদ ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দেয়। এর বিপরীতে, পাকিস্তান ওই সময় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গণ্ডগোল, বৈদেশিক ঋণের বোঝা—এইসব কারণে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতাও ওই সময় এতটাই সমৃদ্ধ হয় যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত অন্যান্য দেশের সমীহ আদায় করতে সমর্থ হয়ে ওঠে। এর একটা বড়ো প্রমাণ হল, ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পারমাণবিক শক্তি সরবরাহকারী গোষ্ঠী (NSG) ভারতের বিরুদ্ধে এতদিনকার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয় এবং ভারতের সঙ্গে অসামরিক পারমাণবিক বাণিজ্যে যুক্ত হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রসঙ্গত অনুরূপ ব্যাপারে পাকিস্তানের আবেদনকে অগ্রাহ্য করা হয়। পাকিস্তান পরামাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, ভারতের সুসংহত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকাশ দুটি দেশের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য গড়ে তোলে। এই ব্যবধান পাকিস্তানকে দুটি বিকল্পের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। একদিকে ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে চ্যালেঞ্জ বজায় রাখতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া, অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক গড়ে তুলে নিজের উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা। দেখা যায় পাকিস্তান অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিকল্পটির দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর দু-দেশের সম্পর্ক যথারীতি আগের পথ ধরেই চলতে থাকে। **ভাজিরাম এবং রবি** (Vajiram and Rabi)-র ভাষায় মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত-পাক সম্পর্ক পূর্বের মতোই পরিচিত পথ ধরেই এগোতে থাকে, যেখানে দেখা যায় সাময়িকভাবে দুটি দেশ ঘনিষ্ঠ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরই এই সম্পর্কের উষ্ণতা এক হিমশীতল অবস্থার মধ্যে ডুবে যায়, যার পরে পরেই ঘটে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বড়ো রকমের ভারত আক্রমণ ("Since the coming to power of Modi Government, India-Pakistan relations have been marked by the familiar trend of periodic short warmth followed by extended chill in bilateral ties in wake of a major terrorist attack in India formented by Pakistan based terrorist groups."–Vajiram and Ravi, *International Relations*)।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের অচলাবস্থা সাময়িকভাবে প্রশমিত হয় ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত 'Heart of Asia Conference'-এ যোগদানকালে। দীর্ঘ তিন বছর পর এটিই প্রথম ভারতের কোনো বিদেশ মন্ত্রীর পাকিস্তান পরিদর্শন। শ্রীমতী স্বরাজ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শদাতা এস আজিজ (Sartaj Azia) একটি যুগ্ম প্রতিবেদনে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করেন এবং এটিকে নির্মূল করার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই যুগ্ম প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পাকিস্তান মুম্বাই হত্যাকাণ্ডের অবিলম্বে সুষ্ঠু বিচার চায়। এর ঠিক পরে পরেই মস্কো এবং কাবুল থেকে ফেরার পথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎ করেই লাহোরে গিয়ে হাজির হন। প্রসঙ্গত ২০০৪ সালে বাজপেয়ীর পর এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তান পরিদর্শন। উভয়দেশের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় উভয় দেশের মধ্যে, বিশেষ করে উভয় দেশের জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু সমস্ত আশায় জল ঢেলে দেয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি। ২০১৬ সালে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী পরপর দুটি বড়ো রকমের আক্রমণ ঘটায় ভারতের ওপর—একটি পাঠানকোট এয়ার ফোর্সের ওপর, অপরটি উরি (Uri) সামরিক শিবিরের ওপর। এই ধরনের উপর্যুপরি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে ভারত কড়াভাবে নিন্দা করে এবং যতপ্রকারে সম্ভব পাকিস্তানকে ধিক্কার জানায় ও পৃথিবীর সমস্ত আন্তর্জাতিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে ("India adopted the strategy of an all-out diplomatic blitz to name, shame and isolate Pakistan at various global platforms"–Vajiram and Ravi)।

অন্যদিকে পাকিস্তানও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। সেও ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রচার শুরু করে দেয়, ভারতের অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চিনের সঙ্গে সখ্যতা বাড়ায়। ইতিমধ্যে বালুচিস্তান ইস্যুকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্তব্যকে পাকিস্তান নিজের অনুকূলে বিশ্বজনমতকে আনার একটা সুযোগ হিসেবে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান নতুন উদ্যমে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যখনই কোনো গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে, তখনই তাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই সাফল্যের পরেই এসেছে গভীর হতাশা। প্রকৃতপক্ষে ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী খোঁজার কাজ রূপকথার 'সিসিফাস'-এর কাজের থেকেও কঠিন, যে সিসিফাস পাহাড় বেয়ে ভারী পাথর কিছুটা তোলার পর সেটি যথারীতি নীচে গড়িয়ে পড়ত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, জাপানের বিদেশনীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক বাধাও যথেষ্ট। জাপানের বৈদেশিক নীতির অন্যতম নির্ধারক উপাদান হল বিদেশ দপ্তরের উচ্চ-পর্যায়ের আমলাতন্ত্র, যা প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল ও পরিবর্তনবিমুখ। বর্তমান জাপানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাইছে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে আরও গতি আনতে, কিন্তু সেখানকার আমলাতন্ত্র ভারতের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে।

তৃতীয়ত, ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আশানুরূপ গতি না পাওয়ার অপর একটি কারণ হল দুটি দেশের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা। জাপানের চাহিদা হল সমুদ্রযান, অসামরিক বিমান, ব্যাংক, বিমা ইত্যাদি, অপরদিকে ভারত চায় তথ্যপ্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, ওষুধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাণিজ্য।

চতুর্থত, জাপানের পারমাণবিক নীতিও ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড়ো বাধা। জাপান যদিও ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অসামরিক পারমাণবিক শক্তি চুক্তিকে (Civilian nuclear energy co-operation treaty) সমর্থন করেছে, কিন্তু পারমাণবিক ইস্যুতে ভারত ও জাপানের মধ্যে এখনও মতপার্থক্য রয়েছে। জাপান চায় ভারত NPT এবং CTBT-তে স্বাক্ষর করুক, কিন্তু ভারত এই দুই চুক্তির পক্ষপাতমূলক নীতির বিরোধিতা করে এখনও এদেরকে মেনে নিতে পারেনি।

এইসব প্রতিকূলতা যতদিন না দূর হচ্ছে, ভারত-জাপান সম্পর্ক ততদিনই অগভীর থেকে যাবে। তবে এই দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক যে আগের তুলনায় অনেকদূর এগিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৭.৮ ভারত-নেপাল সম্পর্ক

Indo-Nepalese Relations

ভারত ও নেপালের সম্পর্ক অতি প্রাচীন হলেও আধুনিককালে এই সম্পর্কের শুরু ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৫০ সাল থেকে, যখন এই দুটি দেশের মধ্যে একটি বন্ধুত্বের চুক্তি (Indo-Nepalese Treaty of Peace and Friendship, 1950) সম্পাদিত হয়। ১৯৫০-এর দশকে নেপালের তৎকালীন শাসকদের (Rana rulers) ভয় ছিল, কমিউনিস্ট চিন যে-কোনো সময় নেপালের কর্তৃত্ববাদী (Autocratic) শাসকদের হটিয়ে দিয়ে নতুন কোনো শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসাবে। এই ভয় থেকে নেপালের রাণা শাসকগোষ্ঠী ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে আগ্রহী হয়। ১৯৫০-এ সম্পাদিত ভারত-নেপাল চুক্তির পর তিন মাসের মধ্যেই অবশ্য রাণা শাসকদের রাজত্বের অবসান ঘটে এবং তার জায়গায় অধিকতর ভারতঘেঁষা 'নেপাল কংগ্রেস' নামক পার্টির হাতে ক্ষমতা আসে।

ক্রমে নেপালের তরাই অঞ্চলে ভারতের লোকসংখ্যা ও কর্মী সংখ্যা বাড়তে থাকলে এবং নেপালের রাজনীতিতে ভারতের হস্তক্ষেপ বেড়ে চলতে থাকলে ভারতের প্রতি নেপালের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে এবং দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরে। এরজন্য অবশ্য নেপালের দায়িত্ব কম ছিল না। কারণ ১৯৫২ সালে নেপাল সরকারের নাগরিকতা আইন (The Nepalese Citizenship Act of 1952) অনুযায়ী ভারতীয়দের নেপালে বসবাসের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। নেপালের নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিও উক্ত আইনানুসারে অত্যন্ত সহজ ছিল।

নেপালে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধির বিষয়টিকে সরকার তথা জনগণ আর বেশিদিন ভালো চোখে দেখেনি। ৬০-এর দশক থেকেই নেপালের রাজপরিবার সহ সাধারণ নাগরিকগণ ভারত বিরোধী হয়ে উঠতে থাকে এবং একই সঙ্গে চিনের দিকে ঢলে পড়তে থাকে। এ ছাড়া ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগে নেপাল জোটনিরপেক্ষতার ওপর ভরসা না রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে এবং সেই মতো ১৯৬০ সালের জুনে ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে ; এর বিপরীতে ভারত সরকার তার বিদেশনীতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ইজরায়েল-এর শত্রুরাষ্ট্র প্যালেস্তাইনকে সমর্থন করতে থাকে।

১৯৬২ সালে ভারত-চিন সীমান্ত যুদ্ধের সময় কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে নতুন দিল্লির দূরত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যায়। ভারত-ভিত্তিক নেপালের বিরোধী দলের প্রতি ভারত সরকার তার সমর্থন তুলে নেয়। অপরদিকে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের পরাজয় নেপালের পক্ষে খুব স্বস্তিদায়ক ঘটনা হয়ে ওঠে এবং নেপাল চিনের কাছ থেকে অনেক ধরনের বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৯৬৯ সালে দু-দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে ওঠে, কারণ ওই বছর নেপাল ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চলতি চুক্তিটির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে এবং নেপাল সীমান্ত থেকে ভারতীয় চেকপোস্টগুলি তুলে নিতে বলে।

ভারত-নেপালের মধ্যে উত্তেজনা চরমে ওঠে ১৯৭০-র দশকে, যখন নেপাল-ভারত বাণিজ্য ও যাতায়াত সংক্রান্ত চুক্তিটি পরিবর্তনের জন্য নেপাল সরকার চাপ দিতে থাকে। ১৯৭৫ সালে ভারতের মধ্যে সিকিমের অন্তর্ভুক্তির (Annexation) বিষয়টিকে নেপাল খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করতে থাকে। নেপালের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী সিকিম রাজ্যের (Kingdom of Sikkim) ভারতভুক্তির প্রেক্ষিতে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র নেপালকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি 'শান্তির এলাকা' (Zone of Peace) হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব খাড়া করে। নেপালের এই প্রস্তাবকে চিন ও পাকিস্তান অনতিবিলম্বে সমর্থন করে নেয়। কিন্তু ভারত তা সমর্থন করেনি। কারণ ভারত মনে করে নেপালের রাজার এই ধরনের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ ১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল চুক্তিকে অস্বীকার করা। ১৯৮৪ সালে নেপাল পুনরায় ওই প্রস্তাবটি তুলে ধরে, কিন্তু এবারেও ভারত তার অতীত সিদ্ধান্তে অটল থাকে। নেপাল শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ফোরামে নিয়ে যায় এবং ১৯৯০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স-সহ ১১২টি দেশকে এই প্রস্তাবের সমর্থনে আনতে সমর্থ হয়। ভারতের বিরুদ্ধে নেপালের শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ করে রাজপরিবারের অসন্তোষের আরও কিছু কারণ ছিল। নেপাল সরকারের বিরোধী দলগুলিকে ভারত বরাবরই আশ্রয় দিয়েছে এবং নানাভাবে মদত দিয়েছে।

১৯৮৮ সালে ভারত নেপালের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্য ও যাতায়াত (Trade and transit) সংক্রান্ত চুক্তি দুটি নবীকরণের প্রস্তাব দিলে, নেপাল তাতে অসম্মতি জানায়। নেপালের যুক্তি ছিল, এই ধরনের চুক্তি দেশের বাণিজ্যিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। ১৯৮৯ সালের ২৩ মার্চ চুক্তি দুটির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এর প্রত্যুত্তরে ভারত নেপালের সঙ্গে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান বন্ধ করে দেয়। ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে নেপালি দ্রব্যের গমনাগমন সংক্রান্ত বিষয়ে নেপাল যেসব সুযোগ-সুবিধা এতদিন যাবৎ ভোগ করে আসছিল, ভারত তা বন্ধ করে দেয়। ভারতের সঙ্গে নেপালের এই বিরোধ নেপালের অর্থনীতিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঐতিহাসিক E Rahim-এর মতে, নেপাল এর আগে কখনও এমন সংকটে পড়েনি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে নেপাল এশিয়ার একটি অন্যতম উন্নতিশীল দেশ ছিল, অল্প দিনের মধ্যেই দেশটি 'পৃথিবীর দুর্বলতম দেশ' (World's poorest nation)-এ পরিণত হল। নেপালও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতকে যতটা সম্ভব অসুবিধায় ফেলার চেষ্টা করেছিল। নেপালে যেসব ভারতীয় কাজকর্ম করে জীবন ধারণ করত, নেপাল সরকার তা বন্ধ করে দেয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের পক্ষ থেকে তেমন একটা সুবিধা আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে নেপাল সরকার অগত্যা তার অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ভারত এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে নেপালের বিরোধী পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে তৎপর হয়ে ওঠে। অবস্থার চাপে নেপালের রাজা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। নতুন সরকারে ভারত-পন্থী দল ক্ষমতাসীন হয় এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে ভীষণভাবে তৎপর হয়ে ওঠে।

১৯৯০-এর দশকের প্রথম থেকে ভারত-নেপাল সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে। নেপালের বিরুদ্ধে ভারতের গত ১৩ মাসের অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং ১৯৯০ সালের জুন মাসে দু-দেশের প্রধানমন্ত্রী— নেপালের K P Bhattarai এবং ভারতের V P Singh নতুন দিল্লিতে মিলিত হয়ে পুরানো নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তিকে নতুন আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী জি পি কৈরালা ভারতে আসেন এবং দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য, যাতায়াত এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়।

নেপালের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী M. M. Adhikary ১৯৯৫ সালে ভারত সফরে আসেন। তিনি নেপালের অনুকূলে আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন রাখেন। আবার একই সঙ্গে চিনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

২০০৫ সালে রাজা জ্ঞানেন্দ্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ভারত-নেপাল সম্পর্ক বেশ তিক্ত হয়ে ওঠে। তবে ২০০৮ সালে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে দু-দেশের সম্পর্ক উন্নতির দিকে এগোতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড (Prachanda) চিন সফরের অব্যবহিত পরই ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতে আসেন এবং বেশ কিছু ব্যাপারে ইতিবাচক আলোচনা হয়। দেশে ফেরার আগে তিনি বলেন, 'আমি নেপাল ফিরছি খুব সন্তোষজনক বার্তা বহন করে। আমি নেপালবাসীকে বলব যে, একটা নতুন যুগের পত্তন হতে চলেছে। ভারত-নেপাল সম্পর্কে একটি বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। আমরা অতীত ভুলে নতুনভাবে একটা মধুর সম্পর্ক সৃষ্টির দিকে এগোতে যাচ্ছি।'

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নেপালে সরকার বহু প্রত্যাশিত নাগরিকতা আইন প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে নেপালের জলসম্পদ নিয়ে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ভারতের তরফেও নেপালকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ভারত থেকে পেট্রোলিয়াম এবং চাল, গম, চিনি ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নেপালে প্রবেশ অবাধ করে দেওয়া হয়। ২০১০ সালে ভারত নেপালকে পর্যাপ্ত ঋণ ও খাদ্যসরবরাহ নিশ্চিত করে। ভারতের তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রী নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডকে শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে সম্ভাব্য সকল রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি : সাম্প্রতিককালে নেপালে মাওবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে এবং চিনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের চাপে নেপাল সরকার ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে, যদিও নেপালের জনগণ চান ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখতে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে দুদেশের সম্পর্ক :

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর ভারতের তরফ থেকে নেপালের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা নতুন করে শুরু হয়। ২০১৪ সালে আগস্টে তিনি নেপাল সফরে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৭ বছর পর। তিনি নেপালকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন নেপালের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্যে। তিনি নেপাল সরকারকে আশ্বাস দেন যে, নেপালে বসবাসকারী ভারতীয় অভিবাসীগণ নেপালের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হবে না এবং সেই কারণে ভারত-নেপাল মুক্ত সীমান্ত দু-দেশের মধ্যে বাধা সৃষ্টি না করে ব্রিজের কাজ করবে ("Open border between Nepal and India should be a bridge and not a barrier.")। উভয় দেশের মধ্যে ২০১৪ সালের নভেম্বরে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে ভারত নেপালকে আরও ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে এখানে একটি ৭০০ মেগাওয়াটের হাইড্রোপাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরির উদ্দেশ্যে। এছাড়া নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্প জনিত ক্ষয়ক্ষতি মেরামতের জন্য ভারত নেপালকে ২০১৬ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের পক্ষ থেকে সদিচ্ছা থাকলেও দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এর পিছনে কারণ হিসেবে একটি তাৎক্ষণিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৭ সালের মার্চে এক নেপালিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী হত্যা করে, যিনি ভারত এবং নেপালের মধ্যে অবস্থিত বিতর্কিত ভূখণ্ডে গিয়ে ভারতের তথাকথিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় নেপালের রাজধানী শহর কাঠমাণ্ডুতে লক্ষ লক্ষ নেপালি রাস্তায় নেমে ভারতের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের অবনতির মূলে রয়েছে দু-দেশের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধ। বিরোধ মূলত দুটি স্থানকে কেন্দ্র করে। একটি হল নেপালের পশ্চিমে ভারত-নেপাল-চিন এই তিন দেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত কালাপানি নামক স্থানে ৪০০ বর্গ কিমি ভূখণ্ড এবং অপরটি নেপালের দক্ষিণে অবস্থিত সুসটা (Susta) অঞ্চলের ১৪০ বর্গ কিমি জায়গা। এই দুই স্থানের প্রকৃত দাবিদার কে, এই নিয়েই দুটি দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধ, কখনো কখনো সংঘর্ষ।

ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটার অন্যতম প্রধান উপাদান হল চিনের অপপ্রচার, দুরভিসন্ধি এবং ভারত বিরোধী ভূমিকা। নেপালের একদিকে ভারত অন্যদিকে চিন। সুতরাং চিন কখনোই চাইবে না নেপালের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিয়ে ভারত কোনোভাবে লাভবান হোক।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ভারত ও নেপালের মধ্যে মতবিরোধের অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল উভয় দেশের মধ্যে প্রচলিত আইনি ও বেআইনি বাণিজ্য। উভয় দেশের মধ্যে উন্মুক্ত সীমান্তের সুযোগ নিয়ে যে বেআইনি বাণিজ্য চলে, তাতে নেপালের ক্ষতি বেশি বলে দাবি করা হয়। এতে নাকি নেপালের শুল্ক আদায়ের পরিমাণ কমে যায়, ফলে রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়।

উভয় দেশের মধ্যে এই ধরনের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহের পরিবেশ থেকে বাস্তবিকপক্ষে কোনো দেশের তেমন একটা লাভ হয়নি, যদিও গত তিন দশক ধরে দুটি দেশই বিভিন্ন মিটিং, কনফারেন্স প্রভৃতির আয়োজন করেছে এবং নানাবিধ পরিকল্পনা করেছে।

৭.৯ ভারত-ভুটান সম্পর্ক

Indo-Bhutan Relations

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভুটান ও ভারত-এদুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং ঘনিষ্ঠ। ভারত ভুটানের তুলনায় সবদিক থেকেই শক্তিশালী দেশ। তাই ভুটানের নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর ভারত যথেষ্ট নজর রেখেছে এবং দেশটি যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমশ এগিয়ে যেতে পারে, সে ব্যাপারে ভারত সচেষ্ট থেকেছে।

ইতিহাস : ভুটান এমন একটা দেশ যে বরাবর বাইরের জগত থেকে স্বতন্ত্র থাকতে চেয়েছে এবং খুব বেশি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ দেখায়নি। ব্রিটিশ আমলে ১৯১০ সালে সম্পাদিত একটি চুক্তি অনুসারে ভুটান ব্রিটিশ-ভারতের একটি আশ্রিত দেশ (Protectorate) হিসেবে থাকতে চায় এবং চুক্তি অনুসারে ভুটানের বৈদেশিক বিষয়সমূহ ও প্রতিরক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব নেয় ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতাকে প্রথম স্বীকৃতি জানায় ভুটান এবং তখন থেকে ভারত-ভুটান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ থেকেছে। ভারত-ভুটান এ দুটি দেশের অভিন্ন সীমান্ত ৬০৫ কিমি দীর্ঘ। এ ছাড়া ভারত হল ভুটানের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। ভুটানের মোট আমদানি-রপ্তানির ৯৮ শতাংশই ভারতের সঙ্গে ঘটে থাকে।

সামরিক সহযোগিতা : ভুটানের সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করার জন্য ভারতের ১০০০ সদস্যবিশিষ্ট একট শক্তিশালী সামরিক প্রশিক্ষণ দল স্থায়ীভাবে ভুটানে অবস্থান করে। এ ছাড়াও প্রয়োজনে ভারতের বাড়তি সেনাবাহিনী ভুটানের সামরিক বাহিনীকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে।

১৯৪৯ সালের চুক্তি : ১৯৪৯ সালের ৮ আগস্ট ভুটান ও ভারতের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল উভয় দেশের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা এবং কেউ কারও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। অবশ্য ভুটান তার বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতকে প্রয়োজনমতো পরামর্শ ও নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয় এবং স্থির হয় বৈদেশিক বা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উভয় দেশ পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবে। এ ছাড়াও চুক্তিতে মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলা থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে ভুটান ভারতের আশ্রিত দেশ নয় ; বরং ভারত কর্তৃক সুরক্ষিত (Protected) দেশ বলাই ভালো, কারণ ভুটান তার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ভারতের হাতে অর্পণ করেনি। এব্যাপারে ভারত পরামর্শ দিতে পারে, তবে সেই পরামর্শ মেনে চলতে ভুটান বাধ্য নয়। তিব্বতকে চিন অধিগ্রহণ করলে ভারত-ভুটান সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভুটান সফরে যান এবং ভুটানের স্বাধীনতা রক্ষায় ভারতের সবরকম সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় ঘোষণা করেন। পরে ভারতের সংসদে নেহেরু ঘোষণা করেন, ভুটানের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে গণ্য হবে।

১৯৫৯ সালে একটি গুজব রটে যায় যে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে চিন, সিকিম ও ভুটান এই দুটি অঞ্চলকে স্বাধীন করতে চায়। এর উত্তরে নেহেরু লোকসভায় বলেন, ভুটানের ভূখণ্ডগত স্বাধিকার ও সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব ভারত সরকারের। নেহেরুর এই ধরনের উক্তি ভুটান মানতে রাজি ছিল না। ওখানকার প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে বলেন, ভুটান ভারতের আশ্রিত দেশ (Protectorate) নয়। তা ছাড়া ১৯৪৯ সালের চুক্তিতে ভুটানের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ভারতকে অর্পণ করা হয়নি।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সুখের বিষয়, ব্যাপারটি আর বেশি দূর এগোয়নি। ভারত আগের মতোই ভুটানকে আর্থিক, সামরিক ও উন্নয়নমূলক সাহায্য চালিয়ে যেতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত-ভুটানের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কোনো দেশই নিজেদের সীমান্ত ভাগাভাগি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেনি ১৯৭৩-'৮৪ সালের আগে পর্যন্ত। উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত করার সময় কয়েকটি ছোটো-খাটো এলাকা বাদ দিয়ে তেমন কিছু বড়ো আকারের মনোমালিন্য ঘটেনি। এককথায় ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।

১৯৭০ সালের পরবর্তীকালের সম্পর্ক : ভারত-ভুটান সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও, ১৯৭০-এর দশক থেকে ভুটান তার বিদেশনীতিতে ধীরে ধীরে কিছু পরিবর্তন আনতে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। সে চায় পুরানো চুক্তিকে কিছুটা সংশোধন করে দেশের সার্বভৌমত্বকে বাড়াতে। ১৯৭১ সালে ভুটান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যোগদান করে। ১৯৭২ সালে ভুটান বাংলাদেশের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদন করে যার মাধ্যমে সে বাংলাদেশকে বিনা শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। ১৯৭৯ সালে কিউবার হাভানাতে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষসম্মেলনে কাম্বোডিয়াকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি হবে না—এই ইস্যুতে ভুটান ভারতের বিপক্ষে গিয়ে চিন ও কিছু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে একমত হয়। তবে ২০০৩-০৪ সালে ভুটানের সেনাবাহিনী ভারত-বিরোধী গোষ্ঠী ULFA-র (United Liberation Front of Assam) বিরুদ্ধে লড়াই চালায় এবং ভারতকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ভুটান ভূখণ্ডের মধ্যে আলফার যাবতীয় ষড়যন্ত্রমূলক কাজকে বাধা দেয়।

২০০৭ সালে ১৯৪৯ সালের ভারত-ভুটান বন্ধুত্বের চুক্তিকে কিছুটা সংশোধন করে ভুটানকে তার বিদেশনীতি নির্ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এই নতুন চুক্তিতে আরও বলা হয়, ভুটান ভারতের অনুমতি ছাড়াই যে-কোনো দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে পারবে। ২০০৮ সালে ভুটানে চরম রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সীমিত রাজতন্ত্র চালু হয়। অর্থাৎ দেশের প্রকৃত ক্ষমতা রাজার পরিবর্তে জনপ্রতিনিধিদের হাতে আসে। ওই বছর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ভুটান সফরে এসে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, গণতন্ত্রের দিকে ভুটানের যে-কোনো পদক্ষেপকেই ভারত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে। এ ছাড়া ভারত-ভুটান সীমান্তের ১৬টি পয়েন্টকে চিহ্নিত করা হয় যেখান দিয়ে ভুটান শুধুমাত্র চিন বাদ দিয়ে যে-কোনো বাইরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে, পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে। ভারত ২০২১ সালের মধ্যে ভুটানের কাছ থেকে ১০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি আমদানি করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে সম্পর্ক :

নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম যে দেশে সরকারি সফরে যান সেটি হল ভুটান। এর দ্বারা মোদী বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি বিশ্বজোড়া সহযোগিতার চেয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। তিনি ভুটানের সুপ্রিম কোর্ট কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন এবং ভুটানকে IT এবং Digital সেক্টরে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মোদীর ভুটান সফরের অপর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ছিল ভুটানের সঙ্গে চিনের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে কিছুটা রোধ করা। এ ছাড়া দু-দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধন দৃঢ় করাও ছিল মোদীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি ভুটানের সঙ্গে হাইড্রো ইলেকট্রিক ডিল সহ বিভিন্ন বিষয়ে বাণিজ্য বাড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এককথায় বলা যায়, মোদীর ভুটান সফর নিছকই একটা সৌজন্যের ব্যাপার ছিল না, এর সঙ্গে দেশের স্বার্থের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ভুটানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে কিছুটা অবনতির দিকে যায়। মোদী চেয়েছিলেন এই ক্ষতটিকে মেরামত করতে, অর্থাৎ ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে। স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে ভুটান ভারতের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, বিশেষ করে ভুটানের অপর প্রান্তে রয়েছে চিন। ভুটানের প্রতি ভারতের আকর্ষণের অন্য একটি উপাদান হল ভুটানের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বৃহৎ উৎস, যেটা কাজে লাগিয়ে ভারত সস্তায় বিদ্যুৎশক্তি পেতে পারে।

ভারত হল ভুটানের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। দু-দেশের মধ্যে ব্যাবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত প্রথম চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালে। ভারত-ভুটান পারস্পরিক সুবিধার স্বার্থে ২০১৬ সালের নভেম্বরে পুনরায় দু-দেশের মধ্যে ওই ধরনের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

চিনের ভূমিকা : ভুটানের একদিকে যেমন ভারত, অপরদিকে তেমনি চিন। দুটিই এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি। স্বাভাবিকভাবেই ভুটানের পক্ষে চিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তা ছাড়া চিন কখনোই ভুটানের বিষয়টি ভুলে থাকতে পারে না, কারণ চিনের কাছেও ভুটান স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক বছর যাবৎ চিন ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করতে বেশি উৎসাহিত হয়ে পড়েছে। ২০১২ সালের প্রথম দিকে ভারতকে অন্ধকারে রেখে ভুটান চিনের সঙ্গে পুরোদস্তুর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বিষয়টিকে ভারত মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। ২০১২ সালে ভুটানের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে ভারত ভুটানকে পেট্রোলিয়াম সাহায্য বন্ধ করে দেয়। ভুটান সরকার ও জনসাধারণ জানে ভারত-চিন এই দুটি দেশের মধ্যে ভারত ভুটানের অপেক্ষাকৃত ভালো বন্ধু। তা ছাড়া বহু আগে থেকেই ভুটান ভূখণ্ডের একটা বড়ো অংশ চিন নিজের বলে দাবি করে আসছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, ভারত-ভুটান সম্পর্ক চিরদিন একই খাতে বয়ে চলেনি। অবশ্য স্থায়ী বন্ধুত্বের বিষয়টি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিরল ঘটনা। কারণ প্রতিটি দেশই মুখে আদর্শের কথা বললেও বাস্তবে নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়। বলা বাহুল্য এই জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি ভারত-ভুটান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ভারতের কাছে ভুটান স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দেশ। সুতরাং ভারত চায় যে-কোনো মূল্যে তাদের সম্পর্ক ভালো রাখতে। ওদিকে চিনও জানে ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা কতখানি জরুরি। ভুটানের দিক থেকেও এটা যেন 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি'র অবস্থা। তার দুই প্রান্তে দুটি দেশই (ভারত ও চিন) এশিয়ার দুটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্র। তাই তার পক্ষে একটা পক্ষকে অসন্তুষ্ট করে অন্য পক্ষের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

৭.১০ ভারত ও শ্রীলঙ্কা

India and Srilanka

ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ভারতের অন্যতম নিকটবর্তী প্রতিবেশী। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক বহু প্রাচীন এবং নিবিড়। উভয়েই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিক। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় দেশই আগ্রহী। উভয় দেশই সার্ক (South Asian Association for Regional Co-operation—SAARC) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তবে শ্রীলঙ্কায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে।

১৯৫৫ সালে শ্রীলঙ্কার সরকার সিংহলী ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলে সংখ্যালঘু তামিল সম্প্রদায় ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলী মানুষদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে এবং ১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে এই বিরোধ চরম বিচ্ছিন্নবাদী তামিল আন্দোলনের রূপ নেয়। শ্রীলঙ্কার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল এল টি টি ই (Liberation Tigers of Tamil Elam)। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কা সরকার সংখ্যালঘু তামিলদের ওপর প্রচণ্ড দমননীতি চালায়। এই দমননীতি থেকে পরিত্রাণের আশায় ১৯৮৩ সালে ১৫,০০০ হাজার তামিল শ্রীলঙ্কা ত্যাগ করে। ক্রমশ এই জাতিগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধের চেহারা নেয়। এই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিন এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়, যা ভারতের কাছে মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না, কারণ শ্রীলঙ্কার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ব্যস্ত বন্দরগুলি ভারতের কাছে কৌশলগতভাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের তামিল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের ওপর তীব্র চাপ আসতে থাকে। ডি এম কে, এ আই ডি এম কে প্রভৃতি তামিলনাড়ুর মুখ্য দুটি দল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, প্রয়োজনে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য ভারত সরকারের ওপর প্রবল চাপ দেওয়া শুরু করে। ডি এম কে চেয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন থেকে বহিষ্কার করতে। এ আই ডি এম কে প্রধান মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রন ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ইন্দিরা গান্ধি শ্রীলঙ্কা সরকারকে জানিয়ে দেন, শ্রীলঙ্কাবাসী তামিলদের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ ভারত সরকার বরদাস্ত করবে না। শ্রীলঙ্কা ভেবে নেয়, ভারত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছে (Abdur Rob Khan, 1986, *Strategic Aspects of Indo-Srilankan Relations*)।

ক্রমশই এটা ভারত সরকারের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে শ্রীলঙ্কা সরকার জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গার মীমাংসায় পুরোপুরি ব্যর্থ। ভারত বরাবরই শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থেকেছে, কারণ ভারতের বৈদেশিক নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকলে এবং এই সুযোগে চিন ও আমেরিকার হস্তক্ষেপ শুরু হলে ভারতের উদ্‌বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভারত এই সময় শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে দু-ধরনের নীতি নিয়ে চলতে থাকে : (ক) এই জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গার রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা চালানো এবং (খ) এল টি টি ই যেন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। অন্যভাবে বললে, ভারতের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে জয়বর্ধনে সরকারের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা তামিল আন্দোলনকারীদের ওপর অমানবিক আচরণ না করে, এবং অন্যদিকে চাইছিল তামিল বিদ্রোহীরা যেন কোনোভাবেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে সফল না হয় ("India's goal was to hit back at the Jaywardene Government and destabilize Sri Lanka without strengthening the rebels to the point where they could succeed in their separatist quest".—Neil Devotta, *India's Foreign Policy Toward Sri Lanka)*।

১৯৮৪ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি খুন হলে তাঁর পুত্র রাজীব গান্ধি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। রাজীব গান্ধি ক্ষমতার আসার অল্পদিনের মধ্যে শ্রীলঙ্কার বিবদমান দুই পক্ষকে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করলেন ভুটানের থিম্পু শহরে ১৯৮৫ সালের জুন ও আগস্ট মাসে। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সরকার এবং বিদ্রোহী তামিল—উভয় পক্ষের অনমনীয় মনোভাবের দরুন আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৮৬ সালে দেখা গেল পরিস্থিতি ক্রমশ জটিলতর আকার নিচ্ছে। দেখা গেল, পাকিস্তান, ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই তিনটি দেশ শ্রীলঙ্কাকে বিভিন্ন প্রকার সামরিক সাহায্য পাঠাচ্ছে, এমনকি গুপ্তচরদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। RAW মারফত এই সংবাদ পেয়ে ভারত সরকারের উদ্‌বেগ বেড়ে যায়। এইভাবে বিদেশি সাহায্য পেয়ে শ্রীলঙ্কার শক্তি বেড়ে যায় এবং ১৯৮৭ সালের মে মাসে শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনী তামিল অধ্যুষিত জাফনা উপদ্বীপ (Jaffna Peninsula) আক্রমণ করে। জয়বর্ধনে স্পষ্টভাবে তাঁর সামরিক বাহিনী প্রধানকে নির্দেশ দেন জাফনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে, শহর পুড়িয়ে দিতে এবং ধ্বংসের পর নতুন করে দ্বীপটিকে পুনর্গঠন করতে ("to raze Zaffna to the ground, burn the town and then rebuild it.")।

ভারত এর জবাবে ১৯৮৭ সালের জুন মাসে 'Operation Eagle' নামে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতের বিমান বাহিনী শ্রীলঙ্কার আকাশ সীমায় প্রবেশ করে এবং শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশে খাদ্য ও ওষুধ পৌঁছে দেয়। পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে এগোতে থাকলে শ্রীলঙ্কা ভারতের প্রস্তাবে রাজি হয়ে ১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধির নির্দেশ অনুযায়ী ভারতের একটি শান্তিরক্ষা বাহিনীকে শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয় ওখানকার জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গা দমনের উদ্দেশ্যে। এটাই সম্ভবত রাজীব গান্ধির জীবনে সবচেয়ে বড়ো ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। সমালোচকদের মতে, এই শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে ভারত কার্যত শ্রীলঙ্কার কাছে পরাজয় স্বীকার করল। শুধু তাই নয়, ভারতের জাতীয় স্বার্থের দিক থেকেও এই ধরনের সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বস্তুত এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে শ্রীলঙ্কা থেকে হাজার হাজার তামিল সম্প্রদায়যুক্ত মানুষ ভারতে আসতে থাকল। বলাবাহুল্য ভারতের মতো একটি জনবহুল দেশে এই ঘটনার পরিণতি কখনোই সুখকর হতে পারে না। ভারত-শ্রীলঙ্কা শান্তি চুক্তিকে এল টি টি ই. তো বটেই, ভারতের প্রত্যেকটি বিরোধী দল কঠোরভাবে সমালোচনা করে। অবশেষে ব্যর্থতার গ্লানি সঙ্গে নিয়ে ১৯৯০ সালে শান্তিরক্ষা বাহিনীকে শ্রীলঙ্কা ছাড়তে হয়।

জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গা কিন্তু চলতেই থাকে। এল টি টি ই. কিন্তু এত বড়ো অপমান ও ধাক্কা হজম করেনি। তাদের যত আক্রোশ তখন শ্রীলঙ্কা সরকারের পরিবর্তে রাজীব গান্ধির বিরুদ্ধে। ১৯৯১ সালের মে মাসে রাজীব গান্ধি যখন নির্বাচনি প্রচারে ব্যস্ত, এল টি টি ই-এর একটি ক্ষুদ্র আত্মঘাতী দল রাজীব গান্ধিকে হত্যা করে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

শ্রীলঙ্কার জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গা মেটাতে ভারতীয় সেনা পাঠানো যদি রাজীব গান্ধির ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তার থেকে শতগুণ ভুল করল LTTE, কারণ এরপর থেকে ভারতের তামিলনাড়ুর সংখ্যাগরিষ্ঠ তামিল জনগোষ্ঠী LTTE-র চরম বিরোধী হয়ে উঠল। তা ছাড়া ভারত সরকারও তৎক্ষণাৎ LTTE-কে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করল।

রাজীব গান্ধিকে হত্যার পর ভারত শ্রীলঙ্কায় পুনরায় সৈন্য পাঠিয়ে হয়তো LTTE-কে উচিত শিক্ষা দিয়ে আসতে পারত। কিন্তু ভারত তা না করে বরং শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে আর কোনোভাবে জড়িয়ে না পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমনকি ২০০০ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার যখন নরওয়ের মধ্যস্থতায় তামিল জঙ্গি সংগঠন LTTE-র সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করে, ভারত সেখানেও কোনো ভূমিকা নিতে অস্বীকার করে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে কাজ করেছিল তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের দাবি।

১৯৯০-এর দশকে ঠান্ডা লড়াই পর্বের অবসান ঘটলে ভারত বেশি করে মন দেয় নিজের অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচিকে সফলভাবে কার্যকর করার প্রতি। এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল আমেরিকার বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক। ভারত যদি পুনরায় শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত, ভারতের এই নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচি রূপায়ণের বিষয়টি বিঘ্নিত হত। তাই তখন থেকে ভারত শ্রীলঙ্কার সঙ্গে অতীতের তিক্ততা ভুলে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (India Srilanka Free Trade Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দু-দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ভারতে শ্রীলঙ্কার রপ্তানির পরিমাণ দশগুণ বেড়ে যায়, আর ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা আগের চেয়ে তিনগুণ বেশি পণ্য আমদানি করে। ২০০১ থেকে ২০০২ এই দু'বছরে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০৩-এই সময়ের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতের এই অর্থনীতিভিত্তিক বিদেশনীতি গ্রহণের মাধ্যমে ভারত শ্রীলঙ্কা তথা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিল যে ভারত অস্থিতিশীল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সহমর্মিতার নীতি গ্রহণে আগ্রহী।

পরবর্তী কয়েক বছরে ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আশানুরূপ পথে এগোয়নি। এর পিছনে দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। **প্রথমটি** হল চিনের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি। ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে কয়েক বছরের তিক্ত সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে চিন চেষ্টা চালিয়েছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করতে এবং এই উদ্দেশ্যে চিন শ্রীলঙ্কাকে নানাপ্রকার বিশেষ করে আর্থিক সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে। শ্রীলঙ্কা তার জাতীয় স্বার্থে ক্রমশ বেশি মাত্রায় চিনের কাছাকাছি এসেছে এবং সেই অনুপাতে ভারতের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। **দ্বিতীয়** কারণটি হল ভারত মহাসাগরে ভারতীয় জেলেদের মাছ ধরা এবং আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কার সীমানার অভ্যন্তরে ভারতের জেলেদের অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব। ঘটনা হল ভারতীয় জেলেরা বেশি মাছ ধরার লোভে প্রায়শই শ্রীলঙ্কার জলসীমার মধ্যে ঢুকে পরে। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী তাদের আক্রমণ করে, কখনো কখনো হত্যাও করে। ভারত সরকার শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর এই অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ করে। অপরদিকে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর দাবি, জেলেদের মাধ্যমে, কখনও বা নিজেরাই জেলে সেজে LTTE জঙ্গিরা কৌশলে ভারত থেকে অস্ত্র আমদানি করে। বলা বাহুল্য এই ঘটনাও দু-দেশের সম্পর্ক শীতল করার পিছনে কাজ করেছে।

অতি সম্প্রতি দুটি দেশকেই পরস্পরের কাছাকাছি আসার আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। ২০১৫ সালে শ্রীলঙ্কার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মৈত্রীপালা সিরিসেনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে আগ্রহ দেখান। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি ভারতের সঙ্গে চারটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি'। অন্যদিকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হন। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে নরেন্দ্র মোদী শ্রীলঙ্কা সফরে যান এবং ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সঙ্গে বৈঠক করেন। আশা করা যায়, উভয় দেশের এই ইতিবাচক মনোভাবের পরিণতিতে দুটি দেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে।

৭.১১ ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
India and the USA

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই। তবে এই দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক খুব বেশিদিন এক খাতে প্রবাহিত হয়নি। দু-দেশের সম্পর্কের মধ্যে ঘটেছে নানান চড়াই-উতরাই।

ভারত স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের চরম মতপার্থক্য শুরু হয়ে যায়। কাশ্মীর প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিনই পাকিস্তানকে কাশ্মীরের ব্যাপারে আক্রমণকারী দেশ রূপে চিহ্নিত করেনি। পুরস্কারস্বরূপ পাকিস্তান সরকার পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। সামরিক এবং কৌশলগত (Strategic) দিক থেকে ভারত উপমহাদেশ বরাবরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই কাশ্মীর সমস্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই অঞ্চলের ব্যাপারে নাক গলানোর তথা প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ করে দেয়।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে দ্বৈরথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার পিছনে আরও অনেক কারণ ছিল। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল, পাকিস্তান যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করত এবং সিদ্ধান্ত নিত, ভারত তার জায়গায় আন্তর্জাতিক বিষয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তা ছাড়া ভারত মুখে জোটনিরপেক্ষতার কথা বললেও কার্যত অনেক বিষয়েই কমিউনিস্ট জোটের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। ১৯৪৯ সালে চিনে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতই প্রথম তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। শুধু তাই নয় গণপ্রজাতন্ত্রী চিন যাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ অর্জন করতে পারে, সে ব্যাপারে ভারতই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। তা ছাড়া কোরিয়া যুদ্ধে ভারত মার্কিন নীতির বিরোধিতা করেছে। ওই সময় চিন-ভারত মৈত্রী স্থাপন, পঞ্চশীল এবং বান্দুং সম্মেলনের সাফল্য প্রভৃতি ঘটনাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত বিরোধী করে তুলতে ইন্ধন জুগিয়েছে।

১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য কট্টর ভারত-বিরোধী অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। তা ছাড়া ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতের ওপর আক্রমণ শুরু করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি, নিরপেক্ষ থেকেছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরে পরেই ভারত চরম খাদ্য সংকটের মধ্যে পড়ে। ওই সময় PL 480 অনুসারে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাশে এসে দাঁড়ায়। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি মার্কিন সফরে যান। ১৯৬৬ সালের জুনে সম্পাদিত একটি চুক্তির ফলে মার্কিন সরকার ভারতকে ৪৮.৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়। শুধু তাই নয়, ১৯৬৮ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন বিশ্বের অন্যান্য সম্পদশালী দেশকেও যুক্তিসংগত শর্তে ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করতে অনুরোধ জানান। ১৯৬৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন ভারত সফরে এলে উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের নতুন আলো দেখা দেয়।

তবে সেই আশার আলো অচিরেই নিভে যায় এবং উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ১৯৭১ সালে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি। এই চুক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুনরায় ভারত বিদ্বেষী করে তোলে। ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিনা প্ররোচনায় ভারত আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিন্দা করা দূরে থাক, উলটে পাকিস্তানকেই সমর্থন জানায় এবং নানাভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে থাকে। উপরন্তু, ভারতকে সবরকম আর্থিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এর পরবর্তী কয়েকটি ঘটনাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রচণ্ডভাবে ভারতবিরোধী করে তোলে,

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner